Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যুগে যুগে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারিতে মুসলিম মনীষীদের ভুমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রানুজা পারভীন

রোলঃ 227022339

২৭ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যুগে যুগে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারিতে মুসলিম মনীষীদের ভুমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রানুজা পারভীন

রোলঃ 227022339

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " যুগে যুগে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারিতে মুসলিম মনীষীদের ভুমিকা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রানুজা পারভীন, আইডিঃ 227022339 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " যুগে যুগে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারিতে মুসলিম মনীষীদের ভুমিকা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

রানুজা পারভীন

(স্বাক্ষর)

রানুজা পারভীন

আইডিঃ 227022339

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৭ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভুমিকা...5

মহামারি বিষয়ে রাসুল (সা.)-এর মূলনীতি 8

মহামারি থেকে যেভাবে ওমর (রা.) বেঁচে ছিলেন.......................................9

বিভিন্ন হিজরিতে মহামারির চিত্র...12

মহামারির কারণ...15

নুহ আ: এর জাতি...16

মাদইয়ান সম্প্রদায় 17

লুত আ: এর জাতি...17

হযরত সালেহ (আ:) এর জাতি..19

মুসা(আঃ) এর জাতি..21

হুদ(আ.)-এর পরিচয় 22

দুনিয়া কাঁপানো যত মহামারি...25

বিপদাপদে এবং দুর্যোগ মুহূর্তে আমাদের করণীয় 32

ভুমিকা

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সাগরে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, ফলে তিনি তাদের তাদের কোনো কোনো কাজের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।’ (সুরা রোম, আয়াত : ৪১)

অর্থাৎ স্থলে, জলে তথা সারা বিশ্বে মানুষের নাফরমানির বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। বিপর্যয় অনেক রকমের হতে পারে। যেমন—দুর্ভিক্ষ, মহামারি, অগ্নিকাণ্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাবলির প্রাচুর্য, সব কিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী বস্তুর উপকার কম এবং ক্ষতি বেশি হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আপদ-বিপদ বোঝানো হয়েছে।(কুরতুবি, বাগভি)

নিম্নে এমন কিছু দুর্যোগের কোরআনি ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো—

ঝড়, অতিবৃষ্টি ও ভূমিধস :

পৃথিবীর মহাদুর্যোগগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ঝড়, অতিবৃষ্টি ও ভূমিধস। মানুষের নাফরমানি ও কুফরির কারণে কখনো কখনো মহান আল্লাহ তাদের এসব দুর্যোগ দিয়ে সতর্ক করেন। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, ‘আর যখন তোমাদের সাগরে বিপদ স্পর্শ করে, তখন তিনি ছাড়া যাদের তোমরা ডাক, তারা (তোমাদের মন থেকে) হারিয়ে যায়; অতঃপর তিনি যখন তোমাদের রক্ষা করে স্থলে আনেন, তখন তোমরা বিমুখ হয়ে যাও। আর মানুষ তো খুব অকৃতজ্ঞ।

তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গিয়েছ যে তিনি তোমাদেরসহ স্থলের কোনো দিক ধসিয়ে দেবেন না অথবা তোমাদের ওপর শিলা বর্ষণকারী বাতাস প্রেরণ করবেন না? তারপর তোমরা তোমাদের জন্য কোনো কর্মবিধায়ক পাবে না। অথবা তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গিয়েছ যে তিনি তোমাদের আরেকবার সমুদ্রে ফিরিয়ে নেবেন না, অতঃপর তোমাদের ওপর প্রচণ্ড বাতাস পাঠাবেন না এবং তোমাদের ডুবিয়ে দেবেন না, তোমরা কুফরি করার কারণে? তারপর তোমরা আমার বিরুদ্ধে এ বিষয়ে কোনো সাহায্যকারী পাবে না।’ (সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৬৭-৬৯)

বজ্র বিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টি : বজ্রপাত আল্লাহ তাআলার শক্তির নিদর্শনগুলোর একটি, যা তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের সাবধান করার জন্য রেখেছেন। তিনি চাইলেই যে কাউকে

এর মাধ্যমে যেকোনো সময় শাস্তি দিতে পারেন। যদিও সব ক্ষেত্রে পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা এমনটি করেন না।

যা আল্লাহ তাআলা নিজেই পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, ‘বজ্র তাঁরই তাসবিহ ও হামদ জ্ঞাপন করে এবং তাঁর ভয়ে ফেরেশতারাও (তাসবিহরত আছে)। তিনিই গর্জমান বিজলি পাঠান, তারপর যার ওপর ইচ্ছা একে বিপদরূপে পতিত করেন। আর তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) অবস্থা এই যে তারা আল্লাহ সম্পর্কেই তর্কবিতর্ক করছে, অথচ তাঁর শক্তি অতি প্রচণ্ড।’ (সুরা রাদ, আয়াত : ১৩)

মানুষের কাজকর্মই বজ্রপাতের মূল কারণ। খোদাদ্রোহিতা, জেনা, ব্যভিচার, পরকীয়া, অন্যায়-অত্যাচার দুনিয়ায় যত বাড়বে, ততই দুনিয়ার বুকে বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ বাড়বে।

জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা :

নুহ (আ.) তাদের আল্লাহর সঙ্গে নাফরমানি ও তাঁর সঙ্গে অন্য কিছুকে শরিক করার শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। তবু তাদের চৈতন্যোদয় হয়নি। অবশেষে আল্লাহর আজাব আসে। এক ভয়ংকর প্লাবন ও জলোচ্ছ্বাস তাঁর জাতির অবাধ্য লোকদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এমন প্লাবন সেই জাতিকে গ্রাস করেছিল, যেই প্লাবন হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে ইতিহাস হয়ে আছে। তখন নুহ (আ.)-এর নৌকায় যারা আশ্রয় নিয়েছিল তারাই রক্ষা পেয়েছিল। আল্লাহ বলেন, ‘আমি তার (নুহের) বংশধরদের অবশিষ্ট রেখেছি বংশপরম্পরায়।’ (সুরা : সাফফাত, আয়াত : ৭৭)

ভূমিকম্প :

মহান আল্লাহ আরো বলেন, ‘বলে দাও, আল্লাহ তোমাদের ওপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নিচ থেকে আজাব পাঠাতে সক্ষম।’ (সুরা আনআম, আয়াত : ৬৫)

তাফসিরবিদদের মতে এর ব্যাখ্যা হলো ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের প্রকৃত রূপ কতটা ভয়াবহ, সে বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, ‘যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে জমিন, এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে পর্বতমালা, অতঃপর তা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়।’ (সুরা ওয়াকিয়া, আয়াত : ৪-৬)

তা ছাড়া মহান আল্লাহ ভূমিকম্পের মাধ্যমেই কিয়ামত সংঘটিত করবেন। এ ব্যাপারে কোরআনে সুরা যিলযাল নামে পূর্ণাঙ্গ একটি সুরা অবতীর্ণ করেছেন।

খরা :

অনাবৃষ্টি ও খরার মূল কারণও আল্লাহর নাফরমানি। আল্লাহর নাফরমানির কারণে কখনো কখনো অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। পবিত্র কোরআনে এই দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণের পথ বাতলে দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘অতঃপর বলেছি, তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল, তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন...।’ (সুরা নুহ, আয়াত : ১০-১১)

অর্থাৎ মানুষ যখন তার নাফরমানি থেকে ফিরে আসবে, মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়ে দুর্যোগ থেকে নিস্তার দেবেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, তোমাদের প্রবল পরাক্রমশালী প্রভু বলেছেন, যদি আমার বান্দারা আমার বিধান মেনে চলত, তবে আমি তাদের রাতের বেলায় বৃষ্টি দিতাম, সকালবেলায় সূর্য দিতাম এবং কখনো তাদের বজ্রপাতের আওয়াজ শোনাতাম না। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ৮৭০৮)

আমাদের উচিত, সব ধরনের দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে মহান আল্লাহর কাছে বেশি বেশি তাওবা করা। মহান আল্লাহ সবাইকে ক্ষমা করুন। আমিন।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রণিধানযোগ্য কারণ হিসেবে পবিত্র কুরআনে আমরা দেখি যে, মানুষের কর্মকাণ্ডের ফল হিসেবেই দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসে।

যেমন, আল্লাহ বলেন- ‘মানুষের কৃতকর্মের কারণে জলে ও স্থলে বিপর্যয় দেখা দেয়। যার ফলে আল্লাহ তাদের কিছু কিছু কৃতকর্মের ফল প্রদান করে থাকেন, যেন তারা পাপ থেকে ফিরে আসে।’ (সুরা রুম : ৪১)।

পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষ বারবার মহামারির কবলে পড়েছে। গবেষকরা বলে থাকেন, প্রতি শত বছরে পৃথিবী একবার মহামারির কবলে পড়ে। পৃথিবীর চেহারা বদলে যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও কখনও মহামারি একটি গোটা সভ্যতা বা জনগোষ্ঠীকেও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। প্লেগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, যক্ষ্মা, কলেরা, গুটিবসন্তসহ অনেক রকম মহামারির মোকাবিলাই মানুষকে করতে হয়েছে। দেড় হাজার বছরের ধর্ম হিসেবে ইসলাম ও মুসলমানরাও অনেক মহামারির মুখোমুখি হয়েছে এবং এর প্রতিরোধ ব্যবস্থায় দৃষ্টান্ত রেখে গেছে।

মহামারি বিষয়ে রাসুল (সা.)-এর মূলনীতি

এ বিষয়ে কয়েকটি হাদিস উসুল তথা মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা যাবে। প্রথমত, উসামা বিন জায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘তুমি কোনো অঞ্চলে মহামারির প্রাদুর্ভাবের কথা শুনলে তাতে প্রবেশ করবে না। তবে সেখানে থাকাবস্থায় প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়লে তুমি সেখান থেকে বের হবে না।’ (বুখারি, হাদিস নং : ৫৭২৮)

আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, ‘আমি রাসুল (সা.)-কে মহামারি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি ইরশাদ করেছেন, তা একটি আজাব। আল্লাহ তাআলা যাদের ইচ্ছা তাদের কাছে প্রেরণ করেন। আল্লাহ তা মুমিনদের জন্য রহমত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তাই কেউ মহামারিতে আক্রান্ত হলে সে যেন ধৈর্যধারণ করে এবং সওয়াবের আশা করে নিজের এলাকায় অবস্থান করে। এ বিশ্বাস রাখবে যে আল্লাহ তাআলা তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন সে তাতে আক্রান্ত হবে, তাহলে সে শাহাদাত বরণকারীর সওয়াব লাভ করবে।’ (বুখারি, হাদিস নং : ৩৪৭৪)

ইসলামের দৃষ্টিতে সংক্রামক রোগ

ইসলামের দৃষ্টিতে শরীরে রোগ-ব্যাধি দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ, আবার তাঁর ইচ্ছায়ই আরোগ্য লাভ করা যায়। কোনো বস্তুর বা ব্যক্তি কাউকে রোগাক্রান্ত করতে পারে না, আবার তা থেকে সুস্থ করে তুলতেও পারে না। আমাদের জীবন-মৃত্যু, সুস্থতা অসুস্থতা একমাত্র আল্লাহর হাতেই। তাই মহান আল্লাহ বিভিন্ন রোগ যেমন সৃষ্টি করেছেন, তার প্রতিষেধকও সৃষ্টি করেছেন, বান্দা কখনো কখনো তাঁর দয়ায় সেই প্রতিষেধক জানতে পারে, আবার কখনো কখনো জানতে পারে না। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসুল (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার নিরাময়ের উপকরণ তিনি সৃষ্টি করেননি। (বুখারি, হাদিস : ৫৬৭৮)

কোনো রোগ আপন শক্তিতে মানুষকে আক্রান্ত কিংবা হত্যা করার শক্তি রাখে না, এটাও সত্য। কিন্তু তাই বলে কোনো এলাকায় রোগ-ব্যাধি দেখা দিলে সেখানে অসতর্ক অবস্থায় চলাফেরার অনুমতিও ইসলাম দেয়নি। কোনো এলাকায় মহামারি কিংবা সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে মহানবী (সা.) সেখানে যাতায়াত করতে বারণ

করেছেন। এর আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে কোথাও রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে আমাদের অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আর 'সংক্রামক রোগ বলতে কিছু নেই' বলতে যে হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে, তার মানে হলো, রোগের কোনো নিজস্ব শক্তি নেই মানুষকে আক্রান্ত করার। তবে যেহেতু রাসুল (সা.) এ সময় সতর্ক থাকতে বলেছেন, তাই কোথাও এ ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে আমাদের অবশ্যই যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এ কারণেই রাসুল (সা.) বলেছেন, 'কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাকো, যেভাবে তুমি বাঘ থেকে দূরে থাকো।' আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে রাসুল (সা.) ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছু নাই বললে বেদুঈন আরব জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল, তবে সেই উটপালের অবস্থা কি যা কোনো বালুকাময় প্রান্তরে অবস্থান করে এবং সুস্থ সবল থাকে? অতঃপর সেখানে কোনো খুজলি-পাঁচড়ায় আক্রান্ত উট তাদের মধ্যে এসে পড়ে এবং সবগুলোকে ওই রোগে আক্রান্ত করে ছাড়ে? (এর জবাবে) তিনি বলেন, তাহলে প্রথম উটটিকে কে রোগাক্রান্ত করেছিল? যে মহান আল্লাহ প্রথম উটটিকে রোগাক্রান্ত করেছিলেন তিনিই তো অন্যান্য উটকে আক্রান্ত করেছেন। (মুসলিম, হাদিস : ৫৭৪২)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'অসুস্থ উটগুলোর মালিক তাঁর উটগুলোকে সুস্থ পশুর দলে পাঠিয়ে দেবে না। (কারণ এতে ওই সুস্থ প্রাণীগুলো রোগাক্রান্ত হতে পারে।) (মুসলিম, হাদিস : ২৮৭৩)

তাই আমরা সংক্রামক রোগকে মহান আল্লাহর হুকুমের চেয়ে শক্তিশালী ভাবার যেমন কোনো সুযোগ নেই, তেমনি কোথাও এ ধরনের রোগ দেখা দিলে তাকে অবহেলা করারও সুযোগ নেই। আমাদের উচিত সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) নির্দেশিত পথ অনুসরণ করা।

মহামারি থেকে যেভাবে ওমর (রা.) বেঁচে ছিলেন

ফিলিস্তিনের আল কুদস ও রামলার মধ্যভাগে অবস্থিত একটি অঞ্চল হলো আমওয়াস বা ইমওয়াস। সেখানে প্লেগ রোগ প্রথম প্রকাশ পায়। অতঃপর তা শামে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের ইতিহাসে তা 'তাউন ইমওয়াস' নামে পরিচিত। ১৯৬৭ সালে ইসরায়েল ইমওয়াস অঞ্চল পুরোপুরি ধ্বংস করে ওই স্থানে কানাডাভিত্তিক ইহুদি তহবিলের

অর্থায়নে একটি পার্ক তৈরি করা হয়। বর্তমানে তা ‘কানাডা পার্ক’ নামে সবার কাছে পরিচিত।

১৭ হিজরি ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে ওমর (রা.) দ্বিতীয়বারের মতো শাম পরিদর্শনের জন্য বের হন। ওমর (রা.) শামে পৌঁছার পর শুনতে পান যে সেখানে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। তা ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করছে।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত, উমর বিন খাত্তাব (রা.) শামের উদ্দেশে বের হন। শামে অবস্থিত তাবুক গ্রামের ‘সারগ’ নামক এলাকার কাছে এলে সেনাপতি আবু উবাদাহ ও অন্য নেতাদের সঙ্গে দেখা হয়। ওমর (রা.)-কে তাঁরা অবহিত করল যে শামে মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁদের কথা শুনে ওমর (রা.) আমাকে বলেন, ‘ইসলামের প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরদের ডাক দাও।’ তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। কেউ বললেন, আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। তা না করে ফিরে যাওয়া আমরা সমীচীন মনে করছি না। অনেকে বলল, আপনার সঙ্গে অনেক মানুষ ও রাসুল (সা.)-এর মহান সাহাবিরা আছেন। এমতাবস্থায় তাঁদের নিয়ে আপনি মহামারি আক্রান্ত এলাকায় যাবেন না।

সবার কথা শুনে ওমর (রা.) বলেন, ‘তোমরা চলে যাও।’ অতঃপর ওমর (রা.) আমাকে বললেন, ‘আনসারদের আমার কাছে ডেকে আনো।’ তাঁদের ডেকে পরামর্শ করলেন। তাঁরাও মুহাজিরদের মতো মতবিরোধ করল। তিনি বলেন, ‘তোমরা চলে যাও।’ অতঃপর আমাকে বলেন, ‘এখানে কুরাইশ বংশের প্রবীণ মুহাজির সাহাবিদের ডাক দাও।’ আমি তাদের ডেকে আনি। তাঁদের মধ্যে দুজনও মতবিরোধ করল না। সবাই অভিন্ন কথা ব্যক্ত করে বলল, আমরা মনে করছি, আপনি সব মানুষকে নিয়ে ফিরে যাবেন। মানুষকে এই মহামারিতে নেবেন না।’

অতঃপর ওমর (রা.) সবাইকে সামনে নিয়ে ঘোষণা দিলেন, ‘আমি চলে যাব। তোমরাও চলে যাও।’ [তখন শামের গভর্নর ছিলেন আবু উবাদায় বিন জাররাহ (রা.)] এ কথা শুনে আবু উবাদাহ (রা.) বললেন, ‘আপনি আল্লাহর তাকদির থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন?’ ওমর (রা.) বলেন, ‘আহ, হে আবু উবাদাহ, এমন কথা তুমি ছাড়া অন্য কেউ বলত!’ মূলত ওমর (রা.) তাঁর মতভিন্নতাকে অপছন্দ করেছেন।

ওমর (রা.) আবু উবায়দার প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ‘হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর এক তাকদির থেকে অন্য তাকদিরের দিকে পালিয়ে যাচ্ছি। যেমন মনে করো, তোমার অনেক উট আছে। তা নিয়ে তুমি এক উপত্যকায় এসেছ। উপত্যকার দুটি প্রান্ত আছে। এক প্রান্ত

উর্বর। আরেক প্রান্ত শুষ্ক। তুমি উর্বর প্রান্তে উট চরালে কি আল্লাহর তাকদিরের ওপর নির্ভর করবে না? এবং শুষ্ক প্রান্তে চরালেও কি আল্লাহর তাকদিরের ওপর নির্ভর করবে না?'

কিছুক্ষণ পর আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) এলেন। কোনো এক প্রয়োজনে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, এ বিষয় সম্পর্কে আমার জ্ঞান আছে। আমি রাসুল (সা.)-এর কাছে শুনেছি, 'তোমরা কোনো অঞ্চলে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাবের কথা শুনলে তাতে প্রবেশ করবে না। তবে সেখানে থাকাবস্থায় প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়লে তোমরা সেখান থেকে বের হবে না।' এ কথা শুনে ওমর (রা.) আলহামদুলিল্লাহ বললেন। অতঃপর সবাই ফিরে গেলেন।' (বুখারি, হাদিস : ৫৭২৯)

ওমর (রা.) মহামারি চরম আকার ধারণের খবর অবগত হন। ওমর (রা.) চাইলেন সেনাপতি আবু উবায়দা (রা.)-কে ফিরিয়ে আনতে। তাই ওমর (রা.) একটি চিঠি লিখলেন, 'তোমার ওপর শান্তি বর্ষণ হোক। তোমার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ সম্পর্কে সরাসরি তোমাকে বলতে চাই। তাই তোমাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বলছি, আমার পত্র পড়ে আমার উদ্দেশে বের হওয়ার আগে পত্রটি তোমার হাতছাড়া করবে না। রাতে পত্র পৌঁছলে সকাল হওয়ার আগেই যাত্রা শুরু করবে। আর দিনের বেলায় পৌঁছলে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই যাত্রা শুরু করবে।' আবু উবায়দা (রা.) পত্র পড়ে উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ আমিরুল মুমিনিনকে ক্ষমা করুন।' অতঃপর ওমর (রা.)-এর উদ্দেশে একটি পত্র লিখলেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আমি আপনার প্রয়োজনের বিষয় বুঝেছি। আমি এখন মুসলিম সেনাবাহিনীতে অবস্থান করছি। তাদের ছেড়ে যেতে চাই না। আল্লাহ তাআলা আমিসহ সবার ব্যাপারে ফায়সালা করবেন। অতএব হে আমিরুল মুমিনিন, আপনার সিদ্ধান্ত থেকে আমাকে মুক্ত করুন। আমার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে আমাকে ছেড়ে দিন।'

আবু উবায়দা (রা.)-এর পত্র পড়ে ওমর (রা.) কাঁদতে থাকেন। আশপাশের মুসলিমরা ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আবু উবায়দা কি শহীদ হয়েছেন? ওমর (রা.) বলেন, 'না, তিনি এখনো শহীদ হননি। কিন্তু ...।' অর্থাৎ শিগগির তিনি শহীদ হবেন।' এর পরই আবু উবায়দা (রা.) প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/৪৪)

মহামারিতে বড় সাহাবিদের ওফাত

অনেক বড় বড় সাহাবি আমওয়াস নামক মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.), মুআজ বিন জাবাল (রা.), ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.), হারিস বিন হিশাম (রা.) সুহাইল বিন আমর (রা.), উতবাহ বিন সুহাইল (রা.)-সহ আরো অনেকে মৃত্যুবরণ করেন। এই মহামারি দীর্ঘদিন পর্যন্ত শামে বিরাজ করে। শামের অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণের পর মুসলিমদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ থেকে ৩৬ হাজারের মতো। আর মহামারিতে এ সময় মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজারের মতো সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন। ফলে সেনাবাহিনীর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বহাল থাকে।

ওমর (রা.)-এর যুগে যেভাবে মহামারির সমাপ্তি ঘটে

আবু উবায়দা (রা.) পরবর্তী সেনাপতি হিসেবে মুআজ বিন জাবাল (রা.)-কে নির্ধারণ করেন। মুআজ (রা.)-এর মৃত্যুর পর আমর ইবনুল আস (রা.)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। তিনি মানুষের উদ্দেশে বক্তব্য দিয়ে বলেন, ‘হে লোকেরা, এই রোগের প্রাদুর্ভাব হলে তা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। তাই তোমরা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নাও। এক বর্ণনা মতে, তোমরা পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন উপত্যকায় চলে যাও।’ অতঃপর সবাই বেরিয়ে পড়ে। বিভিন্ন পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। অবশেষে আল্লাহ তাআলা এই বিপদ থেকে তাদের মুক্ত করেন। আমর (রা.)-এর গৃহীত পন্থা খলিফা ওমর (রা.) জানতে পারেন। তিনি তা অপছন্দ করেননি। (ফাতহুল বারি, ১০/১৯৯)

বিভিন্ন হিজরিতে মহামারির চিত্র

হিজরি নবম শতাব্দীতে পবিত্র মক্কার মহামারির চিত্র

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, মহামারির কারণে অনেক সময় মসজিদও বন্ধ ছিল। এমনকি পবিত্র মক্কা নগরীর হারম শরিফও নিরাপদ ছিল না তখন। তাই সবই জনশূন্য। প্রখ্যাত হাদিসবিশেষজ্ঞ আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানি (রহ.) (মৃত্যু : ৮৫২ হি.) ৮২৭ হিজরিতে মক্কায় প্রকাশ পাওয়া মহামারির ঘটনা বর্ণনা করেন, ‘এ বছরের শুরুতে মক্কায় মহামারি দেখা দিয়েছে। প্রতিদিন ৪০ এরও বেশি লোক মারা গিয়েছে। শুধু

রবিউল আউওয়াল মাসে ১৭ শয়ের বেশি লোক মৃত্যুবরণ করেছে। ওই সময় কেবল দুজনকে নিয়ে মাকামে ইবরাহিমের সামনে (শাফেয়ি মাজহাবের অনুসারী) ইমাম নামাজ পড়াত। আর অন্যান্য মাজহাবের অনুসারী ইমামরা মুসল্লির অভাবে নামাজের ইমামতি করত না। তবে এখানে হারমে নামাজ পুরোপুরি বন্ধ থাকার বিষয়টি সুনিশ্চিত নয়। তবে মৃতের সংখ্যা, অসুস্থ ব্যক্তি ও সংক্রামক রোগ-ব্যাধির কারণে মানুষের উপস্থিতি তেমন ছিল না। কারণ মহামারি সংক্রমণের ভয় সবার মধ্যে। (ইনবাউল গুমরি ফি আবনাইল উমুরি, ৩/৩২৬)

হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে তিউনিশিয়ায় মহামারি

সপ্তম শতাব্দীর মরক্কোর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে আজারি মারাকাশি বর্ণনা করেন, ৩৯৫ হিজরিতে তিউনিশিয়াতে মহামারির প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। ফলে বস্ত্রের সংকট দেখা দেয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। অনেক ধনী নিঃস্ব হয়ে পড়ে। চিকিৎসা, শুশ্রূষা ও মৃতের দাফনকর্মে সবাই ব্যস্ত ছিল। কাইরাওয়ান নগরীর মসজিদগুলো বিরান হয়ে পড়েছিল তখন।' (আল বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, পৃষ্ঠা : ২৭৪)

হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে আন্দালুসের মহামারি

প্রখ্যাত হাদিসবিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিক ইমাম জাহাবি (রহ.) (মৃত্যু : ৭৪৮ হি.) লিখেছেন, আন্দালুসে (বর্তমান স্পেন) ৪৪৮ হিজরিতে কঠিন দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা দিয়েছিল। তখন গ্রানাডায় এত লোকের মৃত্যু হয়েছিল যে সেখানকার মসজিদগুলো মুসল্লি না থাকায় বন্ধ হয়ে যায়। কর্ডোভা নগরী এ ধরনের দুর্ভিক্ষ ও মহামারির সম্মুখীন হয়নি কখনো। তাই এ বছরটি ক্ষুধার বছর হিসেবে পরিচিত।' (তারিখুল ইসলাম, সিয়ারু আলামিন নুবালা)

পঞ্চম শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ায় মহামারি

প্রখ্যাত ফকিহ ও হাদিসবিশেষজ্ঞ আল্লামা ইবনুল জাওজি (রহ.) (মৃত্যু : ৫৯৭ হি.) মধ্য এশিয়া ছড়িয়ে পড়া ভয়ংকর মহামারির কথা বর্ণনা করেছেন। প্রায় ২০ লাখের মতো লোক মৃত্যুবরণ করে এতে। তিনি লিখেছেন, "৪৪৯ হিজরির জুমাদাল উখরায় 'মাওয়ারাআন নাহার' বা ট্রান্সঅক্সিয়ানার ব্যবসায়ীদের একটি পত্র পাওয়া যায়। সেখানে

সীমাহীন কষ্টের এক মহামারি দেখা দিয়েছে। প্রতিদিন এই অঞ্চল থেকে ১৮ হাজার মৃতদেহ দাফনের জন্য বের করা হয়েছে। এই পত্র লেখা পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ছিল ১৬ লাখ ৫০ হাজারের মতো!”

লেখক তখনকার কঠিন সময়ের বর্ণনা দিলেও তা বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি দেশের চিত্রের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পূরক। তিনি বর্ণনা করেছেন, ‘এই অঞ্চলে মানুষের অবাধ যাতায়াত ছিল। কিন্তু এখন আর মানুষের কোনো চিহ্নও দেখা যায় না। সব বাজার বিরান হয়ে আছে। জনশূন্য পথ-ঘাট। সব ঘরের দরজাও বন্ধ। ব্যবসা-বাণিজ্য ও সব কাজকর্ম থেমে আছে। মানুষের রাত-দিনের পুরো সময় কাটে মৃতলোকদের গোসল ও দাফনের ব্যবস্থা করতে করতে। বেশির ভাগ মসজিদ মুসল্লিশূন্য হয়ে পড়ে আছে। (আল মুনতাজাম ফি তারিখিল উমাম, ১৬/১৭)

দোয়া মাহফিলে সমাগম মহামারি বাড়িয়ে দিল!

আল্লামা ইবনে হাজর (রহ.) (মৃত্যু : ৮৫২ হি.) মহামারির সময় জমায়েতের বিরূপ প্রভাবের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বর্ণনা করেন, ‘৮৩৩ হিজরিতে মহামারির সময়ে শিহাবুদ্দিন শরিফ নামের এক ক্ষমতাধর লোক ৪০ জন সম্মানিত ব্যক্তিকে একত্রিত করেন। তাঁদের প্রত্যেকের নাম ছিল মুহাম্মাদ। সবাইকে অর্থ প্রদান করা হয়। শুক্রবারে জুমার পর থেকে জামিউল আজহারে বসে তাঁরা কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকেন। আসরের সময় সন্নিকটে হলে তাঁরা উচ্চৈঃস্বরে দোয়া করা শুরু করেন। তাঁদের আওয়াজ শুনে অনেক লোক আসা শুরু করে। অতঃপর ৪০ জন মিলে দালানের ছাদে উঠে আজান দেওয়া শুরু করেন। তাঁদের এমন অবস্থা দেখে এক লোক শরিফকে বলল, এঁদের কারণে মহামারি আরো ছড়াবে। অতঃপর তাই হয়েছে। মহামারি দিন দিন আরো বাড়তে থাকে।’ (ইনবাউল গুমরি ফি আবনাইল উমুর, ৩/৩৫৬)

মহামারি বেড়ে গেল হজযাত্রীদের আগমনে

৮৪৮ হিজরিতে মিসরে মহামারি ছিল। মহামারির কারণে প্রতিদিনই এক শ বা দুই শ লোক মারা যেত। মৃত্যুর হার বাড়তে থাকে। অতঃপর হজের সময়ে হাজিরা আসতে শুরু করে। এতে করে মৃতের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। এমনকি হাজিদের শিশুসন্তান ও দাসদের অনেকে মারা যায়। প্রতিদিন হাজারেরও বেশি লোক মারা যায়। দেখা যায়,

হাজিদের আগমনে মহামারি আরো বিস্তার লাভ করেছে।' (ইনবাউল গুমরি ফি আবনাইল উমুরি)

ইবনে হানবলি আল হালবি (রহ.) (মৃত্যু : ৯৭১ হি.) বর্ণনা করেছেন, হালবে মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। শাহ মুহাম্মাদ দাকনি নামের এক শিক্ষার্থীর বাবা হোম কোয়ারেন্টিন পরিত্যাগ করে সঙ্গে থাকা সবাইকে নিয়ে এক বাগানে গিয়ে ওঠেন। মৃত্যুকে তিনি খুবই ভয় করতেন। আল্লাহ তাঁকে এবার রক্ষা করেন। কিন্তু অন্য এক মহামারিতে পিতা-পুত্র উভয়ে মৃত্যুবরণ করে। (দুররুল হুবাব ফি তারিখিল হালব)

দুর্যোগের সময় বায়তুল্লাহ ও মসজিদ-ই-নববী

মদিনায় ইয়াজিদ বিন মুআবিয়ার আক্রমণ : যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে অনেক সময় মক্কা ও মদিনার দুই মসজিদে নামাজ ও অন্যান্য ইবাদত বন্ধ ছিল। ৬৩ হিজরিতে ইয়াজিদ বিন মুআবিয়া (রা.)-এর বিরুদ্ধে মদিনাবাসী বিদ্রোহ করে। প্রখ্যাত হাদিসবিশেষজ্ঞ আল্লামা কাজি ইয়াজ (রহ.) (মৃত্যু : ৫৪৪ হি.) ওই সময় মদিনায় ইয়াজিদের বাহিনীর কৃত তাণ্ডবলীলার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, ইয়াজিদের বাহিনী মদিনাবাসীকে পরাস্ত করে হত্যা করা শুরু করে। তিন দিন পর্যন্ত হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে। এ সময় আনসার ও মুহাজিরসহ অনেক সাহাবির সন্তানরা নিহত হয়। ওই সময় মসজিদ-ই-নববীতে নামাজ বন্ধ থাকে। এমনকি আজানও হয়নি তখন।' (ইকমালুল মুলিম বিফাওয়ায়িদি মুসলিম, ৬/২৬১)

মহামারির কারণ

মানুষ পাপ করতে করতে যখন পাপের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখনই আল্লাহর শাস্তি নাজিল হয়। পাপিষ্ঠ ফেরাউনকে আল্লাহ তায়ালা তখনই ধরেছেন, যখন সে নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করেছে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: 'হে মুসা! তুমি ফেরাউনের কাছে যাও, সে অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে গেছে। ' (সূরা: ত্বাহা, আয়াত ২৪)।

নমরুদকে আল্লাহ তায়ালা তখনই শাস্তি দিয়েছেন, যখন সে নিজেকে প্রভু বলে দাবি করেছে। অনুরূপভাবে আদ, সামুদ প্রভৃতি জাতিকে তাদের সীমাহীন পাপাচারের কারণে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

বনি ইসরাইলরা আল্লাহর কিতাব তাওরাতকে অস্বীকার, উত্তম জিনিস তথা মান্না ও সালওয়ার পরিবর্তে খারাপ জিনিস তথা ভূমির উৎপন্ন জিনিস চাওয়া, আমালেকা সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আল্লাহর অগণিত নিয়ামত ভোগ করেও অকৃতজ্ঞ হওয়ার কারণে চির লাঞ্ছনা ও আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয়েছে।
এভাবে পবিত্র কোরআনে যে ৬টি জাতির ধ্বংসের কথা উল্লেখ আছে তা হলো- মাদইয়ান সম্প্রদায়, হুদ (আ.)-এর আদ জাতি, লুত (আ.)-এর জাতি, সালেহ (আ.)-এর সামুদ সম্প্রদায়, নুহ (আ.)-এর জাতি ও মুসা (আ.)-এর জাতি।

নুহ আ: এর জাতি

"তিনি (নূহ) বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার রব প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তার নিজের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দান করে থাকেন, অতঃপর সেটা তোমাদের কাছে গোপন রাখা হয়, আমরা কি এ বিষয়ে তোমাদেরকে বাধ্য করতে পারি, যখন তোমার এটা অপছন্দ কর? আর হে আমার সম্প্রদায়, এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোনো সম্পদ চাই না। আমার প্রতিদান শুধু আল্লাহর কাছে। যারা ঈমান এনেছে, আমি তাদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। নিশ্চয় তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে। কিন্তু আমি তো দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ জাতি'।"[কুরআন ১১:২৮–২৯]
তারপরও তার সম্প্রদায় বিশ্বাস না করে আল্লাহ্-র শাস্তি নিয়ে আসতে বলেছে এবং তাঁকে মৃত্যুর হুমকিও দিয়েছে বলে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,
"তারা বলল, 'হে নূহ, তুমি আমাদের সাথে বাদানুবাদ করছ এবং আমাদের সাথে অতিমাত্রায় বিবাদ করেছ। অতএব যার প্রতিশ্রুতি তুমি আমাদেরকে দিচ্ছ, তা আমাদের কাছে নিয়ে আস, যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও'।"[কুরআন ১১:৩২]
"তারা বলল, 'হে নূহ, তুমি যদি বিরত না হও তবে অবশ্যই তুমি প্রস্তরাঘাতে নিহতদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।"[কুরআন ২৬:১১৬]
দীর্ঘকাল তাওহীদের প্রতি আহ্বানের পর যখন আর কেউ ঈমান আনার সম্ভাবনা থাকল না, তখন কাফিরদের মহাপ্লাবনের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হয় এবং নৌকায় আরোহণ করে নূহ ও অন্য মুমিনরা বেঁচে যায় বলে কুরআনের বিভিন্নস্থানে বলা হয়েছে।

"অতঃপর সে তার প্রতিপালককে আহবান করল যে, ‘নিশ্চয় আমি পরাজিত, অতএব তুমিই প্রতিশোধ গ্রহণ কর’। ফলে আমি বর্ষণশীল বারিধারার মাধ্যমে আকাশে দ্বারসমূহ খুলে দিলাম। আর ভূমিতে আমি ঝর্ণা উৎসারিত করলাম। ফলে সকল পানি মিলিত হল নির্ধারিত নির্দেশনা অনুসারে। আর আমি তাকে (নূহকে) কাঠ ও পেরেক নির্মিত নৌযানে আরোহণ করালাম। যা আমার চাক্ষুস তত্ত্বাবধানে চলত, তার জন্য পুরস্কার স্বরূপ, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।"[কুরআন ৫৪:১০–১৪]

মাদইয়ান সম্প্রদায়

ধারনা করা হয় মাদইয়ান সম্প্রদায় ছিল বর্তমান সিরিয়ার মুয়ান নামক স্থানে। হযরত শোয়াইব (আ.) ছিলেন হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর তৃতীয় স্ত্রী কাতুরার ঘরের পুত্র মাদইয়ানের বংশধর। তিনি মাদইয়ান সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। মাদইয়ান বাসী মাপে কম দিয়ে মানুষের হক আত্মসাৎ করত। দুর্নীতি, রাহাজানি, ধর্ষন, ছিনতাই এবং মজুদদারির মত পাপাকার্যে তারা এমনভাবে লিপ্ত হল যে, এসব করা যে পাপ তা তারা ভুলে গেল।শোয়াইব আঃ আল্লাহর প্রেরিত নবী ছিলেন এবং তিনি মাদইয়ান সম্প্রদায়ের কাছে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন এবং তাদের ভুল শুধরাতে বললেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা, তারা উল্টা আল্লাহর নবীকে নিয়ে উপহাস ঠাট্টা শুরু করল। তারা যখন উপদেশ মানল না এবং নিজেদের না শুধরিয়ে সীমালঙ্ঘন করল তাদের জন্য তখন ভয়াবহ গজব অপেক্ষা করছিল।কয়েক দিন তাদের অঞ্চলে প্রচন্ড- গরম পড়ল। গরমে তারা ছটফট করতে লাগল। অতঃপর কাছাকাছি একটা ময়দানের ওপর গাঢ় মেঘমালা দেখা দিল। ময়দানে মেঘের ছায়া পড়ল। শীতল বাতাস বইতে লাগল। এলাকার সবাই ওই ময়দানে উপস্থিত হলো। বলতে লাগল, এই মেঘ থেকে আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। কিন্তু তাদের ওপর অগ্নিবৃষ্টি শুরু করল। আর নিচের দিকে শুরু হলো প্রচন্ড- ভূমিকম্প। ফলে সবাই সেখানে ধ্বংস হয়ে গেল।

লুত আ: এর জাতি

এই জাতির বসবাস ছিল ইরাক এবং ফিলিস্তিনির মধ্যবর্তী স্থানে। এই জাতির কেন্দ্রীয় শহর ছিল ‘সাদুম’ নগরী। সাদুম ছিল সবুজ শ্যামল এক নগরী। কারণ এখানে পানির পর্যাপ্ত সরবরাহ ছিল। ফলে ভূমি ছিল অত্যন্ত উর্বর এবং শস্যে ভরপুর। এমন প্রাচুর্যময়

জীবনযাত্রা বেপরোয়া করে তোলে তাদের। শুধু তাই নয়, পৃথিবীতে তাদের মধ্যেই সর্বপ্রথম সমকামিতার প্রবণতা দেখা দেয়।বিকৃত পাপাচারে আকৃষ্ট হয়েছিল তারা, নর নারী সংগম না করে বরং নর-নর, নারী-নারী মেলামেশা করত প্রকাশ্যে।তাদের এই পাপাকার্য থেকে ফিরে আসার জন্য দাওয়াত দিলেন আল্লাহর নবী লূত আ: এবং আল্লাহর আদেশ নির্দেশ মানার কথা বললেন কিন্তু সেই জাতি সীমা লংঘন করল এবং আগের মতই পাপ কার্য চালিয়ে গেল গুটি কয়েক ব্যতিত। অত:পর তাদের উপর নেমে আসল আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব।লুত আ: আল্লাহর নির্দেশে তার অনুসারীদের নিয়ে শহর ত্যাগ করলেন। এক শক্তিশালী ভূমিকম্প পুরো নগরটি সম্পূর্ণ উল্টে দেয়। ঘুমন্ত মানুষের ওপর তাদের ঘরবাড়ি আছড়ে পড়ে। পাশাপাশি আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো কঙ্কর নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। ওই মহাপ্রলয়ের হাত থেকে কেউ রেহাই পায়নি। ওই জনপদের ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান।লুত (আ.)-এর জাতির ধ্বংসস্থলটি বর্তমানে ‘বাহরে মাইয়েত’ বা ‘বাহরে লুত’ নামে খ্যাত। এটি ডেড সি বা মৃত সাগর নামেও পরিচিত। ফিলিস্তিন ও জর্দান নদীর মধ্যবর্তী স্থানে বিশাল অঞ্চলজুড়ে নদীর রূপ ধারণ করে আছে এটি। জায়গাটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বেশ নিচু। এর পানিতে তেলজাতীয় পদার্থ বেশি। এতে কোনো মাছ, ব্যাঙ, এমনকি কোনো জলজ প্রাণীও বেঁচে থাকতে পারে না। এ কারণেই একে ‘মৃত সাগর’ বলা হয়।সাদুম উপসাগরবেষ্টিত এলাকায় এক ধরনের অপরিচিত উদ্ভিদের বীজ পাওয়া যায়, সেগুলো মাটির স্তরে স্তরে সমাধিস্থ হয়ে আছে। সেখানে শ্যামল উদ্ভিদ পাওয়া যায়, যার ফল কাটলে তার মধ্যে পাওয়া যায় ধুলাবালি ও ছাই।এখানকার মাটিতে প্রচুর গন্ধক পাওয়া যায়। এই গন্ধক উল্কাপতনের অকাট্য প্রমাণ। ১৯৬৫ সালে ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধানকারী একটি আমেরিকান দল ডেড সির পার্শ্ববর্তী এলাকায় এক বিরাট কবরস্থান দেখতে পায়, যার মধ্যে ২০ হাজারেরও বেশি কবর আছে। এটি থেকে অনুমান করা হয়, কাছেই কোনো বড় শহর ছিল। কিন্তু আশপাশে এমন কোনো শহরের ধ্বংসাবশেষ নেই, যার সন্নিকটে এত বড় কবরস্থান হতে পারে। তাই সন্দেহ প্রবল হয়, এটি যে শহরের কবরস্থান ছিল, তা সাগরে নিমজ্জিত হয়েছে।সাগরের দক্ষিণে যে অঞ্চল রয়েছে, তার চারদিকেও ধ্বংসলীলা দেখা যায়। জমিনের মধ্যে গন্ধক, আলকাতরা, প্রাকৃতিক গ্যাস এত বেশি মজুদ দেখা যায় যে এটি দেখলে মনে হয়, কোনো এক সময় বিদ্যুৎ পতনে বা ভূমিকম্পে গলিত পদার্থ বিস্ফোরণে এখানে এক ‘জাহান্নাম’ তৈরি হয়েছে।

হযরত সালেহ (আ:) এর জাতি

হজরত সালেহ (আ.) ছিলেন হজরত নুহ (আ.)-এর ছেলে সামের বংশধর। তার সম্প্রদায়ের নাম ছিল সামুদ। সামের অধস্তন বংশধরে একজন প্রতাপশালী লোক ছিল সামুদ। সেই বীরপুরুষের নামেই এই গোত্রের নামকরণ হয়। এই গোত্রের বসবাস ছিল সৌদি আরবের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে হিজর নামক স্থানে; সেই স্থানটি এখন 'মাদায়েনে সালেহ' নামে পরিচিত। সামুদ ছিল শক্তিশালী ও বীরের জাতি। প্রস্তর খোদাই ও স্থাপত্যবিদ্যায় তাদের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। পর্বত খোদাই করে তারা বাসস্থান নির্মাণ করত। মাদায়েনে সালেহ অঞ্চলে এখনও সেই আমলের স্থাপত্যের নিদর্শনাবলি ও সামুদি শিলালিপি বিদ্যমান রয়েছে।সামুদ জাতিও প্রথমে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে এক সময় আল্লাহ ও পরকালকে ভুলে যায় এবং মূর্তিপূজা শুরু করে এবং শিরকে লিপ্ত হয়। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় চিরন্তন বিধান অনুযায়ী তাদের হেদায়েতের জন্য হজরত সালেহ (আ.)-কে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন। হজরত সালেহ (আ.) ছিলেন সম্ভ্রান্ত, বিচক্ষণ, প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি। যতদিন তিনি অহিপ্রাপ্ত হননি এবং মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহ্বান করেননি গোত্রের লোকজন ততদিন তাকে সমীহ ও মান্য করত। নবুয়ত লাভের পর তিনি তাদেরকে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদত করতে আহ্বান করেন। তিনি বললেন, 'হে আমার জাতি! আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। তিনিই জমিন হতে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে তোমাদের বসতি দান করেছেন। অতএব তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর তাঁরই দিকে ফিরে চলো। আমার পালনকর্তা নিকটেই আছেন। কবুল করে থাকেন, সন্দেহ নেই।' (সুরা হুদ : ৬১)সালেহ (আ.) ছিলেন বিশুদ্ধভাষী এবং উচ্চকণ্ঠের বাগ্মী। বড় বড় সমাবেশে তিনি দাওয়াতের কাজ করতেন। যুক্তির নিরিখে দরদি কণ্ঠে আল্লাহর বাণীসমূহ শোনাতেন। মূর্তিপূজার কঠিন পরিণতির কথা বলতেন। আখেরাতের কথা শোনাতেন। জান্নাতের নেয়ামতরাজির কথা বলে তাদের উদ্বুদ্ধ করতেন। জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করতেন। কিন্তু গোত্রের লোকজন যেই মাত্র তার মুখে মূর্তিপূজার অসারতার বাণী শুনল, সঙ্গে সঙ্গে হজরত সালেহের প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য অস্বীকার করে বলল, 'হে সালেহ! ইতঃপূর্বে তোমার কাছে আমাদের বড় আশা ছিল। আমাদের বাপ-দাদা যা পূজা করত তুমি কি আমাদেরকে তার পূজা করতে নিষেধ করো? কিন্তু যার প্রতি তুমি আমাদের

আহ্বান করছ আমাদের তাতে এমন সন্দেহ রয়েছে যে, মন মোটেই সায় দিচ্ছে না।' (সুরা হুদ : ৬২)। হজরত সালেহ (আ.) তাদেরকে বিভিন্নভাবে উপমা ও দৃষ্টান্ত বলে বলে বোঝাতে থাকলেন। বললেন, দুনিয়া চিরস্থায়ী বাসস্থান নয়। এখানকার ভোগবিলাস ক্ষণিকের মাত্র। সুতরাং তোমরা পরকালের চিন্তা করো।কিন্তু সামুদ জাতির অধিকাংশ লোক হজরত সালেহ (আ.)-কে অস্বীকার করল। তবে যুক্তিতর্কে কোনোভাবেই যখন তারা হজরত সালেহ (আ.)-কে সত্যের দাওয়াত থেকে নিবৃত করতে পারল না তখন সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল- তার কাছে অলৌকিক কোনো দাবি পেশ কববে। এক দিন তারা সবাই একত্রিত হয়ে হজরত সালেহকে বলল, আপনি যদি সত্যি আল্লাহর নবী হন তবে আমাদেরকে কাতেবা পাহাড়ের ভেতর থেকে দশ মাসের গর্ভবতী সবল ও স্বাস্থ্যবতী উষ্ট্রী বের করে দেখান। হজরত সালেহ (আ.) তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার নিলেন, যদি আমি তোমাদের দাবি পূরণ করতে পারি তা হলে তোমরা আমার প্রতি ও আমার দাওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে কি না? সবাই এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল করলেন। সেই পাহাড় ফেটে ভেতর থেকে তাদের দাবির অনুরূপ একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী বের হয়ে এলো।এই অলৌকিক উষ্ট্রী দেখে উপস্থিত অনেকেই হজরত সালেহ (আ.)-এর ওপর ঈমান নিয়ে আসে। কিন্তু এমন প্রকাশ্য মুজেজা প্রত্যক্ষ করেও কিছু হতভাগা ঈমান আনল না। হজরত সালেহ (আ.) তাদের সতর্ক করে বললেন, 'আল্লাহর এই উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শন। অতএব তাকে আল্লাহর জমিনে বিচরণ করতে দাও এবং তাকে মন্দভাবে স্পর্শও করো না। নতুবা অতিসত্বর তোমাদেরকে আজাব পাকড়াও করবে।' (সুরা হুদ : ৬৪)। কিন্তু গোত্রের কিছু দুষ্কৃতকারী লোক এই অলৌকিক প্রাণীটি হত্যা করে ফেলে। হত্যা করেই তারা ক্ষান্ত হলো না, হজরত সালেহ (আ.)-এর কাছে এসে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বলল, তুমি সত্যিকারের রাসুল হলে তোমার প্রতিশ্রুত আজাব আনো দেখি! আমরা তো উষ্ট্রীটি হত্যা করেছি। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ওপর শাস্তি নেমে আসে।আল্লাহ তায়ালা সেই অবস্থার বিবরণ দিয়ে বলেন, 'অতঃপর তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করল এবং স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তারা বলল, হে সালেহ! নিয়ে এসো যা দ্বারা আমাদের ভয় দেখাতে, তুমি যদি রাসুল হয়ে থাকো। অতঃপর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে সকালবেলায় নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।' (সুরা আরাফ : ৭৭-৭৮)। অন্য আয়াতে আছে, তাদের ওপর প্রচণ্ড ও বিকট শব্দবোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সামুদ সম্প্রদায়ের ওপর

একই সঙ্গে ভূমিকম্প ও বিকট গর্জন এসেছিল এবং তারা এই দুটি শাস্তিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা বহু নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন। তাদের মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষদের হেদায়েত ও পথপ্রদর্শন করেছেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলগণকে অস্বীকার করেছিল তাদের ভয়াবহ ও রোমহর্ষক পরিণতি হয়েছে। সেসব পরিণতির কিয়দংশ পরবর্তীদের শিক্ষার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ রেখে দিয়েছেন। যেমন- ডেড সি, ফেরাউনের লাশ এবং হজরত সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের বিধ্বস্ত বাড়িঘর। মানুষ যেন এসব নিদর্শন দেখে দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর প্রতি সেজদাবনত হয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের শিক্ষা অর্জনের তৌফিক দান করুন। আমিন।

মুসা(আঃ) এর জাতি

মুসা (আ:) এবং হারুন যখন ফেরাউনের দরবারে উপস্থিত হয়ে ফেরাউনের কাছে তাদের নবুওয়াত ঘোষণা করেন, তখন ফেরাউন মুসাকে তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে এবং মুসা উত্তর দেন যে পূর্ববর্তী প্রজন্মের জ্ঞান আল্লাহর কাছে রয়েছে। ফেরাউন মূসাকে প্রশ্ন করেছিল" বিশ্বজগতের পালনকর্তা কী?" মুসা উত্তর দেন যে আল্লাহ আকাশ, পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সবকিছুর মালিক। ফেরাউন তখন মুসাকে সে যে লোকটিকে হত্যা করেছিল তার কথা মনে করিয়ে দেয়। মুসা স্বীকার করেন যে তিনি অজ্ঞতাবশত এই কাজটি করেছেন, কিন্তু জোর দিয়ে বলেন যে তিনি এখন ক্ষমা এবং আল্লাহ্ দ্বারা পরিচালিত। মূসা তাকে অবহিত করেন যে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছেন। ফেরাউন যখন নিদর্শনগুলো দেখতে চায়, তখন মুসা তার লাঠিটি মেঝেতে ফেলে দেন এবং এটি একটি সাপে পরিণত হয়। তারপর সে তার হাত বের করেন, এবং একটি উজ্জ্বল সাদা আলো জ্বলে। ফেরাউনের পরামর্শদাতারা তাকে পরামর্শ দেন যে এটি জাদুবিদ্যা[১১], এবং তাদের পরামর্শে তিনি রাজ্যের সেরা জাদুকরদের ডেকে পাঠান।ফেরাউন মুসাকে জাদুকরদের সাথে যুদ্ধের জন্য চ্যালেঞ্জ করে।

জাদুকরদের সাথে সংঘর্ষ:

যখন যাদুকররা ফেরাউনের কাছে আসে, তখন সে তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় যে তারা বিজয়ী হলে সম্মানিত হবে। জাদুকররা জাদু করে পর্যবেক্ষকদের ভয় দেখায়। প্রথমে, মুসা জাদুকরদের জাদু দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন, কিন্তু আল্লাহ্ তাকে আশ্বস্ত করেন। যখন মুসা লাঠিটি মেঝেতে ফেলে দেন এবং এটি একটি সাপে পরিণত হয়ে জাদুকরদের সমস্ত সাপকে গ্রাস করে।জাদুকররা বুঝতে পারে যে তারা একটি অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। তারা মুসার বাণীতে বিশ্বাসের ঘোষণা দেয় এবং ফেরাউনের হুমকি সত্ত্বেও হাঁটু গেড়ে বসে। এতে ফেরাউন ক্ষুব্ধ হয়ে সতর্ক করেন যে, তারা যদি মুসার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন , তাহলে তিনি তাদের হাত-পা কেটে ফেলবেন এবং খেজুর গাছের কান্ডে ক্রুশবিদ্ধ করবেন। তবে, জাদুকররা তাদের নতুন বিশ্বাসের প্রতি অবিচল থাকে এবং ফেরাউনের দ্বারা শাস্তি পায়।

মুসার বিরুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর,ফেরাউন মুসা এবং ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করতে থাকে। ফেরাউন ইস্রায়েলীয়দের মিশর ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। কোরানে বলা হয়েছে যে আল্লাহ ফেরাউন এবং তার লোকদের উপর শাস্তির আদেশ দেন। এই শাস্তিগুলি বন্যার আকারে তাদের বাসস্থান ধ্বংস করে, পঙ্গপালের ঝাঁক ফসল ধ্বংস করে, উকুন এর মহামারী জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে,বসন্ত এবং সমস্ত পানীয় জল রক্তে পরিণত হয়।[১২] কুরআন উল্লেখ করেছে যে আল্লাহ্ মুসাকে ইস্রায়েলীয়দের সাথে রাতে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং তাদের সতর্ক করেন যে তাদের অনুসরণ করা হবে। ফেরাউন ইসরায়েলীদের রাতের বেলা চলে গেছে বুঝতে পেরে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাড়া করে।তাকে ও তার বাহিনীকে সাগরে নিক্ষেপ করা হয়।

“

কাজেই আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম, অতঃপর তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। এখন দেখ, যালিমদের পরিণতি কী হয়েছিল।

হুদ(আ.)-এর পরিচয়

হুদ (আ.) একজন নবী। তিনি দুরর্ধষ ও শক্তিশালী ‘আদ’ জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। বিশ্ববাসীর জন্য শিক্ষার উপকরণ হিসেবে আল্লাহতায়ালা পৃথিবীর অনেক

জাতিকে সমূলে ধ্বংস করেছেন। আল্লাহর গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশ্বের প্রধান ছয়টি জাতির মধ্যে নুহ (আ.) এর সম্প্রদায়ের পরে ‘আদ’ সম্প্রদায় ছিল দ্বিতীয় জাতি। হুদ (আ.) ছিলেন আদ বংশেরই একজন। ‘আদ ও ছামুদ ছিল নুহ (আ.)-এর পুত্র সামের বংশধর এবং নুহের পঞ্চম অথবা অষ্টম অধস্তন পুরুষ।

আদ জাতির বসতি ও পরিণতি:

আদ সম্প্রদায়ের ১৩টি গোত্র ছিল। আম্মান হতে হাদারামাউত ও ইয়ামান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাদের বসতি। তাদের ক্ষেত-খামারগুলো ছিল সজীব ও ফলফসলে পূর্ণ। তাদের ছিল সব ধরনের বাগ-বাগিচা। তারা ছিল সুঠাম ও দীর্ঘ দেহের অধিকারী। তৎকালীন আদ সম্প্রদায়ের শক্তি ও বাহাদুরির খুব খ্যাতি ছিল। নিজেদের অর্থ সম্পদ, ফল-ফসল ও প্রাচুর্যের আধিক্যে তারা ভুলে যায় নিজেদের রবকে। ভুলে যায় সঠিক পথে জীবনযাপন করার পথ ও পদ্ধতি। ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে অহংকারী। আর ডুবে যায় মূর্তিপূজার গভীরে। এরাই পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার মূর্তিপূজা ও শিরকের প্রচলন করে। তাদের ঘটনাবহুল জীবন ধারায় সর্বকালের মানুষের জন্য শিক্ষা রয়েছে। তাদের অশুভ পরিণতিতে রয়েছে বোধসম্পন্ন মানুষের জন্য ভাবনার খোরাক। চলার পথের পাথেয়। রবের অনুগত বান্দা ও প্রকৃত মানুষ হওয়ার বিবিধ উপকরণ। আল্লাহর বান্দারা অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনের ১৭টি সুরায় ৭৩টি আয়াতে হুদ (আ.) ও ‘আদ’ সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যাতে শিরক ও অহংকারের পরিণতি কী হয়, তা ভেবে যুগে যুগে বান্দারা সতর্ক হতে পারে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা আদ সম্প্রদায়ের অহংকার ও পরিণতির কথা উল্লেখ করে বলেন, তাদের ঘটনা এই ঘটল যে, তারা পৃথিবীতে অন্যায় দম্ভ প্রদর্শন করতে লাগল এবং বলল, ‘আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী কে আছে? তবে কি তারা অনুধাবন করল না, যে আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী? মূলত তারা আমার আয়াতগুলো অস্বীকার করত।’ (সুরা ফুছছিলাত : ১৫)।

ধ্বংসের কারণ:

কোনো জাতির অন্যায় ও জুলুম যখন স্বাভাবিক আচরণে পরিণত হয়, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি আজাব ও গজব ধেয়ে আসে। অহংকারে মানুষ যখন নিজের

অস্তিত্ব ও অবস্থানের কথা ভুলে যায়, তখনই আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেয়। যেসব কারণে হুদ (আ.) এর উম্মত আদ জাতি ধ্বংস হয়েছিল, তা নিচে তুলে ধরা হলো-

১. আদ সম্প্রদায় তাদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। নবীর দাওয়াত গ্রহণ করেনি। নিজেদের মনগড়া পথেই অবিচল ছিল।

২. তাদের প্রতি আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহগুলোকে তারা অবমূল্যায়ন করেছিল, যার ফলে তারা আল্লাহর আনুগত্য হতে বিমুখ হয়ে শয়তানের আনুগত্য বরণ করে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিল।

৩. আল্লাহর নেয়ামতরাজিকে নিজেদের জন্য চিরস্থায়ী ভেবেছিল তথা দুনয়িার জীবনকেই একমাত্র জীবন ভেবে আখেরাতকে অস্বীকার করেছিল।

৪. আল্লাহর গজব থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন কল্পিত উপাস্যের অসীলা ধরে পূজা-অর্চনা শুরু করেছিল। একত্ববাদকে গ্রহণ না করে বহুত্ববাদকে গ্রহণ করে শিরকে লিপ্ত ছিল।

৫. তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করত; কিন্তু আল্লাহর গজব থেকে নির্ভীক ছিল।

৬. তারা অযথা উঁচু স্থানগুলোতে সুউচ্চ টাওয়ার ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করত, যা অপচয় ছাড়া কিছুই ছিল না। (সুরা শুআরা : ১২৮)।

৭. তারা বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করত এবং ভাবত যেন তারা পৃথিবীতে চিরকাল বসবাস করবে। (সুরা শুআরা : ১২৯)।

৮. তারা দুর্বলদের ওপর নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করত এবং মানুষের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালাত। (সুরা শুআরা : ১৩০)।

তুফান দিয়ে শাস্তি:

আল্লাহতায়ালা আদ জাতির প্রতি অনুগ্রহের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের বক্রবুদ্ধির কারণে তাদের নেয়ামতই তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছিল ও অন্যকে পথভ্রষ্ট করেছিল। এ জন্য আল্লাহতায়ালা তাদের শাস্তির সম্মুখীন করলেন আর পৃথিবীতে ঘোর অপরাধীদের শোচনীয় পরাজয় ও লাঞ্ছনার বিষয়টি শিক্ষণীয় হিসেবে পবিত্র কোরআনে স্থান দিলেন। মহান আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের প্রতি শাস্তি স্বরূপ প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া পাঠালেন। পবিত্র কোরআনে এর বর্ণনা এসেছে।

আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘আমি অশুভ কিছু দিনে তাদের প্রতি পাঠালাম প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া, তাদের দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করানোর জন্য। আর

আখেরাতের শাস্তি তো আরো বেশি লাঞ্ছনাকর এবং (সেখানে) তারা পাবে না কোনো সাহায্য।' (সুরা ফুছছিলাত : ১৬)।
তাফসিরে মাআরিফুল কোরআনে মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ.) তাফসিরে কুরতুবি ও মাযহারির উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, যাহহাক বলেন, 'আল্লাহতায়ালা আদ সম্প্রদায়ের ওপর তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত সম্পূর্ণ বন্ধ রাখেন। সে সময়ে শুধু প্রবল শুষ্ক বাতাস প্রবাহিত হতো। অবশেষে আট দিন ও সাত রাত পর্যন্ত উপর্যুপরি তুফান চলতে থাকে।'
অনাবৃষ্টি আল্লাহর গজব:
বৃষ্টি আল্লাহর রহমত। খরা বা অনাবৃষ্টি আল্লাহর গজব। যখন অনাবৃষ্টি ও গরম বাতাস বইতে থাকবে, তখন বেশি বেশি ইস্তেগফার করা মোমিনের বৈশিষ্ট্য। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহতায়ালা কোনো সম্প্রদায়ের মঙ্গল চাইলে তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। পক্ষান্তরে আল্লাহতায়ালা কোনো জাতিকে বিপদগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের ওপর বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন এবং প্রবল বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে।' (তাফসিরে মাআরিফুল কোরআন : সুরা ফুছছিলাত : ১৬)। আদ সম্প্রদায়কে আল্লাহতায়ালা প্রথমে একটানা তিন বছর অনাবৃষ্টি অতঃপর দীর্ঘ আট দিন তুফানের মাধ্যমে আজাবে পতিত করে ধ্বংস করেছিলেন।

কোরআন-হাদিসে মহামারি ও বালা-মুছিবতকে মানুষের গুনাহের ফসল বলা হয়েছে। সে হিসেবে করোনা ভাইরাসও আমাদের গুনাহ ও অন্যায়ের ফসল।
বান্দা যখন বেপরোয়াভাবে গুনাহ করে আল্লাহতায়ালা তাকে সতর্ক করতে বিভিন্ন পরীক্ষায় ফেলেন। যেন সে গুনাহ থেকে নিবৃত্ত হয়।
আগের নবীদের এসব কাহিনী পবিত্র কোরআনে আলোচনা করে আল্লাহ তায়ালা এটিই বোঝাতে চেয়েছেন যে, যদি উম্মতে মুহাম্মদী (সা.)ও তাদের মতো পাপাচারে লিপ্ত হয়, তবে তাদের পরিণতিও অনুরূপ হবে এবং একই ভাগ্য বরণ করতে হবে।

দুনিয়া কাঁপানো যত মহামারি

মহামারির ইতিহাস মানব সভ্যতার মতোই প্রাচীন। বিভিন্ন সময় সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে কোনো নির্দিষ্ট এলাকায়, কখনও আবার বিশ্বব্যাপী। প্লেগ, কলেরা, যক্ষা, কুষ্ঠ,

ইনফ্লুয়েঞ্জা, গুটিবসন্ত বিভিন্ন রোগ নানা সময়ে মহামারির আকার নিয়েছে। সে রকম কিছু মহামারির তথ্য তুলে ধরা হলো-

প্লেগ অব এথেন্স (খ্রিস্টপূর্ব ৪৩০ অব্দ):গ্রিক ইতিহাসবিদ থুসিডিডিস (৪৬০-৪০০ খ্রিষ্টপূর্ব) লিখেছেন, "সুস্থ-সবল মানুষের হঠাৎ করে শরীরে তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছিল। চোখ লাল হয়ে জ্বালাপোড়া শুরু হয়েছিল। জিভ ও গলা লালচে হয়ে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছিল। " এই মহামারি আসলে কী ছিল, তা পরবর্তীতে বিজ্ঞানীদের একটি বিতর্কের বিষয় হয়ে রয়েছে।

জাস্টিনিয়ান প্লেগ (৫৪১ খ্রিস্টাব্দ):সিএনএনের তথ্য অনুযায়ী, ৫৪১ খ্রিস্টাব্দে শুরু হলেও এই মহামারি চলে প্রায় দুই শতাব্দী ধরে। মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোতে প্রায় পাঁচ কোটি মানুষের প্রাণ নেয় এই মহামারি। ব্যাকটেরিয়াজনিত এই রোগ ইঁদুরের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

দ্য ব্ল্যাক ডেথ (১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দ):ইউরোপের অন্যতম প্রাণসংহারী মহামারি 'ব্ল্যাক ডেথ'। লাইভসায়েন্সের তথ্য মতে, এশিয়া থেকে ইউরোপে ছড়িয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যায় এই প্লেগ। অনেকের মতে, এই মহামারিতে ইউরোপের অর্ধেকের মতো মানুষ প্রাণ হারায়।

কলেরা মহামারি:এই রোগটি প্রথম বৈশ্বিকভাবে মাথাব্যথার কারণ হয়ে ওঠে ১৮১৭ সালে। ওই বছর বাংলাদেশের যশোরে এই রোগের প্রাদুর্ভাবে মানুষের প্রাণহানি ঘটতে থাকে। কিছু দিনের মধ্যে তা বর্তমান ভারত, শ্রীলঙ্কা ও মিয়ানমারের অধিকাংশ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৮২০ সাল নাগাদ থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপিন্সে মহামারি আকারে এই রোগ দেখা দেয়। ওই সময় ইন্দোনেশিয়ার শুধু জাভা দ্বীপেই কলেরায় এক লাখ মানুষের মৃত্যু হয়।

স্প্যানিশ ফ্লু (১৯১৮-১৯২০):মৃতের সংখ্যার হিসাবে আধুনিক যুগের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ মহামারির একটি হচ্ছে ১৯১৮ সালে ধরা পড়া স্প্যানিশ ফ্লু। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যেখানে পাঁচ বছরে ১ কোটি ১৬ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়, সেখানে স্প্যানিশ ফ্লুতে মাত্র দুই বছরে মারা যায় ২ কোটি মানুষ। লাইভসায়েন্স ডটকমের তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ সাগর থেকে উত্তর মেরু পর্যন্ত ৫০ কোটির মতো মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়। তাদের এক পঞ্চমাংশের মৃত্যু ঘটে, অনেক আদিবাসী গোষ্ঠী বিলুপ্তির পথে চলে যায়। ১৯১৮ ও ১৯১৯ সালের মধ্যে স্প্যানিশ ফ্লুতে আনুমানিক ৫ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়।

এশিয়ান ফ্লু (১৯৫৭-১৯৫৮):এশিয়ান ফ্লুতে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১১ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই মারা গিয়েছিল ১ লাখ ১৬ হাজার মানুষ। পরে ভ্যাকসিন দিয়ে ওই মহামারি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছিল।

গুটি বসন্ত:বেশ পুরনো ইতিহাস এই রোগের। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে গুটি বসন্ত ছিল এই পৃথিবীতে। ষষ্ঠ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক নাগাদ বিশ্বজুড়ে এই রোগের দাপট ছিল। গড়ে আক্রান্তদের প্রতি ১০ জনের মধ্যে তিনজনের মৃত্যু ঘটে। যারা বেঁচে যেতেন তাদের শরীরের ক্ষতচিহ্ন তার আক্রান্ত হওয়ার কথা মনে করিয়ে দিত। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে চলে আসা প্রাণঘাতী গুটি বসন্ত টিকার মাধ্যমে নির্মূল হয়েছে ১৯৭৯ সালে।

শতকের পর শতক বিশ্বের নানা প্রান্তে প্রাণহানি ঘটিয়ে চলা এই রোগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা কলেজ অব মেডিসিনের সহকারী ডিন এবং প্রফেসর অব মেডিসিন হিসাবে কর্মরত সেজান মাহমুদ লিখেছেন, “খ্রিষ্টপূর্ব ১০ হাজার বছর থেকে মানুষের মধ্যে অস্তিত্ব ধরলে বলা যায়, এই রোগ ১২ হাজার বছর ধরে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন (৫০ কোটি) লোকের মৃত্যু ঘটিয়েছে। এখন এটি পৃথিবী থেকে একেবারে বিদায় নিয়েছে টিকার কারণে। ”

এইচআইভি:(১৯৮১ থেকে চলমান) হিউম্যান ইমিউনোডিফিসিয়েন্সি ভাইরাস-এইচআইভি প্রথম শনাক্ত হয় ১৯৮০-এর দশকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, বর্তমানে আনুমানিক তিন কোটি ৬৯ লাখ মানুষের দেহে এই ভাইরাস রয়েছে। বিশ্বজুড়ে এইডসে প্রাণ হারিয়েছেন তিন কোটি ৪০ লাখের বেশি মানুষ, যাতে এখনও চিকিৎসা আবিষ্কার না হওয়া এই রোগ ইতিহাসের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক মহামারির একটিতে পরিণত হয়েছে।

সার্স:একুশ শতকে প্রথম যে সংক্রামক রোগ আতঙ্ক হয়ে এসেছিল তার নাম ‘সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম’- সার্সও; এটিও এক ধরনের করোনা ভাইরাস।

প্রথম সার্স আক্রান্ত রোগী মিলেছিল চীনেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে এই ভাইরাস শনাক্ত হয়। ফ্লু উপসর্গের এই রোগে প্রায় ২৬টি দেশে আক্রান্ত হয়েছিল ৮ হাজারের বেশি মানুষ; মারা গিয়েছিল অন্তত আটশ জন। তবে মানব শরীরে কী করে এই জীবাণুর সংক্রমণ ঘটেছিল সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

ইবোলা:প্রাণঘাতী ইবোলা ভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ দেখা দেয় ১৯৭৬ সালে, একইসঙ্গে কঙ্গো ও দক্ষিণ সুদানের দুটি অঞ্চলে। পরে ইবোলা নদীর তীরবর্তী একটি গ্রামে এর প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে ভাইরাসটি ইবোলা নাম পায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, ভয়াবহ এই রোগে মৃত্যু হার ৫০ শতাংশের মতো। ইবোলার টিকা দেওয়া হলেও এখনো এই রোগ নির্মূল করা যায়নি।

কোভিড-১৯:২০২০ সাল শুরুর আগ মুহূর্তে চীনের উহানে যে নতুন ভাইরাস বাসা বেঁধেছিল মানুষের শরীরে, সেই ভাইরাস লাখ লাখ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিল বছরজুড়ে। বছরব্যাপী দুনিয়াজুড়ে আতঙ্ক হয়ে থাকা এই ভাইরাস নাম পেয়েছে নভেল করোনা ভাইরাস (সার্স সিওভি-২), আর রোগের নাম হয়েছে কোভিড-১৯।

এ যাবৎ পৃথিবীতে যত মহামারি এসেছে তার মধ্যে করোনা ভাইরাসই বর্তমানে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে সবচেয়ে দ্রুত ছড়িয়েছে। এরই মধ্যে (১৫/০১/২০২১ খ্রি: পর্যন্ত) বিশ্বে এই রোগে ৯১.৬ মিলিয়নের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে ১.৯৬ মিলিয়নের বেশি মানুষের। সরকারি হিসাবে বাংলাদেশে সাত লাখের বেশি মানুষ আক্রান্ত এবং প্রায় সাড়ে ১০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বিশ্বব্যাপী দ্রুত ছড়িয়ে পড়া মারাত্মক সংক্রামক এ রোগে স্থবির হয়ে পড়ে পুরো বিশ্ব। স্বস্তির খবর এই নতুন করোনা ভাইরাসের টিকা এরইমধ্যে কয়েকটি দেশে প্রয়োগ করা শুরু হয়েছে। তবে যুক্তরাজ্যসহ কয়েকটি দেশে এই ভাইরাসের নতুন ধরন শনাক্ত হয়েছে, যা আবার বিজ্ঞানীদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুনিয়াবি এসব মহামারি বা বিপর্যয় ও বিভিন্ন বিপদ-আপদ সম্পর্কে মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

'স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুণ বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে। ' (সূরা: রূম, পারা: ৩০, আয়াত: ৪১)।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ

'বলুন, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পুর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক। ' (সূরা: রূম, পারা: ৩০, আয়াত: ৪২)।

হাদিস শরিফে প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي... لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ

...যখন কোনো কওমের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা তা প্রকাশ্যেও করতে শুরু করে তবে তাদের মাঝে দুর্ভিক্ষ ও মহামারি ব্যাপক আকার ধারণ করে, যা তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে ছিল না। ' (ইবনু মাজাহ, আসসুনান : ৪০১৯)।

রোগের মহামারি নিয়ে পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনে বেশ কিছু আয়াত রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আয়াত নিম্নে দেওয়া হলো-

সুরা আহযাব: আয়াত-৯: আর তারপর আমি তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম এক ঝঞ্ঝা বায়ু এবং এক বাহিনী। এমন এক বাহিনী যা তোমরা চোখে দেখতে পাওনি।

সুরা আনআম: আয়াত-৪২: তারপর আমি তাদের ওপর রোগব্যাধি, অভাব, দারিদ্র্য, ক্ষুধা চাপিয়ে দিয়েছিলাম, যেন তারা আমার কাছে নম্রতাসহ নতি স্বীকার করে।

সুরা ইয়াসিন: আয়াত-২৮-২৯: তারপর (তাদের এই অবিচারমূলক জুলুম কার্য করার পর) তাদের বিরুদ্ধে আমি আকাশ থেকে কোনো সেনাদল পাঠাইনি। পাঠানোর কোনো প্রয়োজনও আমার ছিল না। শুধু একটা বিস্ফোরণের শব্দ হলো, আর সহসা তারা সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল (মৃত লাশ হয়ে গেল)।

সুরা আ'রাফ: আয়াত-১৩৩: শেষ পর্যন্ত আমি এই জাতিকে পোকামাকড় বা পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত, প্লাবন ইত্যাদি দ্বারা শাস্তি দিয়ে ক্লিষ্ট করি।

সুরা বাকারা: আয়াত-২৬: নিশ্চয়ই আল্লাহ মশা কিংবা এর চাইতেও তুচ্ছ বিষয় (ভাইরাস বা জীবাণু) দিয়ে উদাহরণ বা তার নিদর্শন প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ করেন না।

সুরা আ'রাফ: আয়াত-৯৪: ওর অধিবাসীদের আমি দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগব্যাধি এবং অভাব-অনটন দ্বারা আক্রান্ত করে থাকি। উদ্দেশ্য হলো তারা যেন, নম্র এবং বিনয়ী হয়।

সুরা মুদ্দাসসির: আয়াত-৩১: তোমার রবের সেনাদল বা সেনাবাহিনী (কত প্রকৃতির বা কত রূপের কিংবা কত ধরনের) তা শুধু তিনিই জানেন।

সুরা আল-আনআম: আয়াত-৬৫: তুমি তাদের বলো যে, আল্লাহ তোমাদের ঊর্ধ্বলোক হতে বা ওপর থেকে এবং তোমাদের পায়ের নিচ হতে শাস্তি বা বিপদ পাঠাতে পূর্ণ সক্ষম।

সুরা আল আ'রাফ: আয়াত-৯১: তারপর আমার ভূমিকম্প তাদের গ্রাস করে ফেলল। ফলে তারা তাদের নিজেদের গৃহেই মৃত অবস্থায় উল্টো হয়ে পড়ে রইল।

সুরা আল কামার: আয়াত-৩৪: তারপর আমি এই লুত সম্প্রদায়ের ওপর প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বর্ষণকারী এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু।

সুরা বাকারা: আয়াত-১৪৮: নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি বস্তুর ওপর (অর্থাৎ আরশ, পঙ্গপাল কিংবা ভাইরাস) সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান, সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন।

সুরা বাকারা: আয়াত-১৫৫: আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা, জান-মালের ক্ষতি এবং ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে পরীক্ষা করব। তবে তুমি ধৈর্যশীলদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।

মুমিনদের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই:মুমিনের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। সে সর্বদা আল্লাহর ফায়সালা ও সিদ্ধান্তের ওপর সমর্পিত থাকে। বিশেষ করে বান্দা যখন আল্লাহ তায়ালার হুকুম মেনে চলে তবে তার জীবন হয় চিন্তামুক্ত।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'জেনে রাখো, আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরা ইউনূস : ৬২)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি মহামারিতে পতিত হয় এবং নেকির আশায় সে ধৈর্য্যসহকারে সেখানে অবস্থান করে এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তাআলার হুকুম ব্যতিত কিছুই হয় না, তাহলে সে শহীদের সওয়াব পায়। (বুখারী শরীফ : ৫৪০২)।

হাদিসে এসেছে-হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'এমন কোনো রোগ নেই যা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেননি। আর তিনি এর প্রতিষেধকও সৃষ্টি করেছেন। '

তাছাড়া আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে যে কোনো বিষয়ে 'তাক্বওয়া' বা তাকে ভয় করা এবং 'তাওয়াক্কুল' তথা তার ওপর ভরসা করার কথা বলেছেন। কেননা এমন কিছু জিনিস আছে যা আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া কোনো মানুষই তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে তিন দিন সকালবেলা মধু পান করবে, সে কোনো মারাত্মক মৌসুমি রোগে আক্রান্ত হবে না। ' (ইবনে মাজাহ)

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কালোজিরা ব্যবহার কর। কালো জিরায় রয়েছে 'শাম' ছাড়া প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধক। আর 'শাম' হলো মৃত্যু। ' (বুখারি)

হাদিসে কালোজিরাকে শুধু মৃত্যু ছাড়া সব রোগের প্রতিষেধক বলা হয়েছে। সুতরাং করোনাসহ সব মহামারিতেও কালো জিরা হতে পারে রোগ ও ভাইরাসের প্রতিষেধক। এছাড়া ২ হাজার বছর ধরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণাও দেখা গেছে যে, কালোজিরায় বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও এন্টি ভাইরাসের উপাদান বিদ্যমান।

সুতরাং মহামারি করোনা থেকে মুক্তি পেতে হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়মিত মধু ও কালোজিরা খাওয়ার পাশাপাশি মুয়াব্বিজাতের আমল করা করা যেতে পারে। তাতে করোনাসহ মারাত্মক সব মহামারি থেকে মানুষ থাকবে নিরাপদ, ইনশাআল্লাহ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তিনবার বলবে-

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَالسميع العليم

সকাল হওয়া পর্যন্ত ওই ব্যক্তির ওপর আকস্মিক কোনো বিপদ আসবে না। আর যে ব্যক্তি সকালে তিনবার এ দোয়া পড়বে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার ওপর কোনো বিপদ আসবে না। (তিরমিজি, আবু দাউদ)

অর্থ: 'আল্লাহর নামে, যার নামের বরকতে আসমান ও জমিনের কোনো বস্তুই ক্ষতি করতে পারে না, তিনি সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী। '

اَللَّهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُوْنِ وَ الْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّءِ الْاَسْقَامِ

(আবু দাউদ, তিরমিজি)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ وَ الْاَدْوَاء

(তিরমিজি)

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে পবিত্র কোরআন-হাদিসের নির্দেশনা মেনে যে কোনো মহামারিমুক্ত থাকার তাওফিক দান করুন। হাদিসের ওপর যথাযথ আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

বিপদাপদের কারণ:

বর্তমান বিশ্ব নানাবিধ বিপদে আক্রান্ত। নিত্যনতুন দুর্যোগ-বিপদে গোটা বিশ্ব আতঙ্কিত। একেকটি দুর্যোগে মানুষের উন্নত প্রযুক্তি, শক্তি ও দম্ভোক্তি ধুলায় মিশে যাচ্ছে।

মানবজাতির এ অসহায়ত্ব মহান রাব্বুল আলামিনের বাণীরই সত্যায়ন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, মানুষকে অতি দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। (সুরা নিসা; আয়াত ২৮)

বিভিন্ন সময়ে নানা দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এর পেছনে আমাদের দায় রয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে তার ওপর ইমান আনয়ন ও তার হুকুম মান্য করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'আমি মানুষ ও জিন জাতিকে শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।' (সুরা জারিয়াত; আয়াত ৫৬)

কিন্তু বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ তাকে সৃষ্টি করার এ উদ্দেশ্য ভুলে গেছে। তারা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি ও আনুগত্যের পরিবর্তে আল্লাহর নাফরমানিতে আকণ্ঠ ডুবে আছে।

আমরা যারা মুসলিম, যারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে দাবি করে থাকি, তাদেরও অধিকাংশ অহরহ আল্লাহর নাফরমানি করে যাচ্ছে। নামাজ-রোজার পাবন্দি নেই। হজ-জাকাতের গুরুত্ব নেই। আল্লাহর নাফরমানি থেকে বাঁচার প্রচেষ্টা নেই। সুদ-ঘুষ, জুলুম-নির্যাতন, ধোঁকা-প্রতারণা, ধর্ষণ-লুণ্ঠনসহ সব প্রকার গুনাহই মুসলিম সমাজে চলছে।

এতসব অন্যায়, অবাধ্যতা ও সীমা লঙ্ঘনের পরও আল্লাহ তা'আলা তার অপার অনুগ্রহে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমাদের ওপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (সুরা শূরা; আয়াত ৩০)

আল্লাহ তা'আলা যদি মাফ না করতেন, তাহলে পুরো ধরাপৃষ্ঠ মানবশূন্য হয়ে পড়ত। কখনো আল্লাহ তা'আলা কিছুটা শাস্তি ও বিপদাপদ দিয়ে মানুষকে সতর্ক করেন এবং তওবা করে দ্রুত তার আনুগত্যে ফিরে আসার সুযোগ দেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে। (সুরা রূম; আয়াত ৪১)

বিপদাপদে এবং দুর্যোগ মুহূর্তে আমাদের করণীয়

এক. তওবা করা ও ইসলামের অনুশাসন পরিপূর্ণভাবে মেনে চলা

বিপদ-আপদ ও দুর্যোগ চলাকালে আমাদের জন্য সর্বপ্রথম করণীয় হলো, সব ধরনের গুনাহ বর্জন করা এবং খালেস দিলে তওবা করা ও পরিপূর্ণ ইসলামি জীবনযাপনে শপথ নেয়া। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'হে মুমিন সকল! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্কানুসরণ করো না। নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' (সুরা বাকারা; আয়াত ২০৮)।

সুতরাং ইবাদত-বন্দেগি, লেনদেন, আচার-আচরণ, বিবাহ-শাদিসহ সব কাজ ইসলামের নির্দেশনা মোতাবেক সম্পাদন করা চাই। নিজের ভেতর-বাহিরকে কোরআন-সুন্নাহর আলোকে সজ্জিত করা চাই।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'আর তোমার পালনকর্তা এমন নন যে জনবসতিগুলোকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবেন, সেখানকার লোকেরা সৎকর্মশীল হওয়া সত্ত্বেও।' (সুরা হুদ; আয়াত ১১৭)।

ভবিষ্যতে সব গুনাহ থেকে বিরত থাকার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে তওবা করা প্রয়োজন। তাহলেই সফলতা আসবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।' (সুরা নুর; আয়াত ৩১)।

তওবার মাধ্যমে অত্যাসন্ন বিপদও দূর হয়ে যায়। যেমন- হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামের কওমের ক্ষেত্রে হয়েছিল। আল্লাহর আজাব যখন কালো হয়ে গোটা আকাশ ছেয়ে ধেয়ে আসছিল, তখন তারা তওবা করেছিল এবং ইমান আনয়ন করেছিল। ফলে আল্লাহ তাদের ওপর থেকে আজাব উঠিয়ে নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'সুতরাং কোনো জনপদবাসী কেন এমন হলো না যে তারা ইমান এনেছে, অতঃপর তাদের সে ইমান গ্রহণ হয়েছে কল্যাণকর? অবশ্য ইউনুসের সম্প্রদায়ের কথা আলাদা। তারা যখন ইমান আনে, তখন আমি তুলে নিই তাদের ওপর

থেকে পার্থিব জীবনের অপমানজনক আজাব এবং তাদের কল্যাণ পৌঁছাই এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত।' (সুরা ইউনুস; আয়াত ৯৮)।

দুই. তাকওয়া অবলম্বন, সুন্নতের অনুসরণ এবং ইস্তিগফার করা
আল্লাহ তা'আলা কোরআনে করিমে ইরশাদ করেন, 'অথচ আল্লাহ কখনই তাদের ওপর আজাব নাজিল করবেন না, যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন। তা ছাড়া তারা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, আল্লাহ কখনো তাদের ওপর আজাব দেবেন না।' (সুরা আনফাল; আয়াত ৩৩)।

এই আয়াতে আল্লাহর আজাব না আসার দুটি কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে। ১. প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকা। ২. ইস্তিগফার করতে থাকা (গুনাহ হলে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকা)।

বর্তমানে প্রথমটি প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া তো সম্ভব নয়; কিন্তু উলামায়ে কেরাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করল এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করল সেও যেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গেই আছে। সুতরাং সেও আজাব থেকে বেঁচে থাকবে।

হজরত মু'আজ বিন জাবাল রাজি. যখন ইয়েমেন যাচ্ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সঙ্গে কিছুপথ হেঁটে চললেন। অতঃপর বললেন, মু'আজ! এরপর হয়তো আমার সঙ্গে তোমার আর দেখা হবে না। এরপর যখন মদিনায় আসবে হয়তো আমার মসজিদ ও আমার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে। এ কথা শুনে হজরত মু'আজ রাজি. কাঁদতে লাগলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'নিশ্চয়ই আমার কাছের মানুষ হলেন মুত্তাকিগণ সে যেই হোক, যেখানেই থাকুক।' (মুসনাদে আহমাদ; হাদিস ২২৯৫১)।
সুতরাং এই হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হলো- যারা মুত্তাকি তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেই আছে। তারা আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা পাবে ইনশা-আল্লাহ। আর মুত্তাকিরা আল্লাহ তা'আলার বন্ধুও। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কেবল মুত্তাকিরাই আল্লাহর বন্ধু।' (সুরা আনফাল; আয়াত ৩৪)।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার বন্ধুদের আজাব দেবেন না।

সুরা আনফালের ৩৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচার দ্বিতীয় উপায় বলা হয়েছে ইস্তিগফার তথা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি ইস্তিগফারকে (গুনাহ থেকে মাফ চাওয়া) অপরিহার্য করে নেবে আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রত্যেক সংকট থেকে মুক্তি দেবেন, প্রত্যেক পেরেশানি থেকে উদ্ধার করবেন এবং তাকে অকল্পনীয় স্থান থেকে রিজিক দান করবেন।' (সুনানে আবু দাউদ; হাদিস ১৫১৮)।

এ জন্য জালালুদ্দীন রুমি রহ. বলেছেন, যখনই কোনো পেরেশানি দেখো সঙ্গে সঙ্গে ইস্তিগফার করো। কেননা এই পেরেশানি আল্লাহর হুকুমে এসেছে, সুতরাং তার হুকুমমতো আমল করো।

তিন. নাহি আনিল মুনকার বা অসৎ ও অন্যায় অবিচার বন্ধে সচেষ্ট হওয়া

আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচার জন্য শুধু নিজে পাপাচার থেকে বিরত থাকাই যথেষ্ট নয়; বরং নাহি আনিল মুনকার তথা নিষিদ্ধ ও অন্যায় কাজ থেকে অন্যকে বারণ করাও আবশ্যক। অবিচার ও পাপাচার বন্ধে সচেষ্ট হওয়াও জরুরি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই মানুষ যখন কাউকে জুলুম করতে দেখেও তাকে বাধা দেয় না, তখন আল্লাহ তা'আলা হয়তো তাদের ওপর আজাবকে ব্যাপক করে দেবেন।' (সুনানে তিরমিজি; হাদিস ২১৬৮, সুনানে আবু দাউদ; হাদিস ৪৩৩৮)।

এ-জাতীয় বহুসংখ্যক আয়াত ও হাদিসের আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচতে হলে অবশ্যই সাধ্যানুযায়ী অন্যকেও পাপাচার থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে।

চার. ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা।

বিপদাপদে অধৈর্য না হওয়া। অস্থির না হওয়া ও বিলাপ না করা। বরং আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে পরম ধৈর্যের সঙ্গে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকা। নামাজ ও ইবাদত-বন্দেদির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করতে থাকা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন। (সুরা বাকারা; আয়াত ১৫৩)।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হলে নামাজ পড়তেন। (সুনানে আবু দাউদ; হাদিস ১৩১৯)

Reference

1. https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2020/03/31/892732
2. https://www.dhakapost.com/religion/2215
3. www.dainikbangla.com.bd
4. https://www.hadithbd.com › detail